Fwd: E-learning Sample (Bengali Short Story : Narendranath Mitra)

1 message

Sukanta Bhattacharyya <sukanta.polsc@gmail.com> Fri, Mar 27, 2020 at 11:15 AM
To: skanamulhoda@gmail.com

--------- Forwarded message ---------
From: **Arijit Bhattacharyya** <ab3mankarcollege@gmail.com>
Date: Thu, 26 Mar 2020, 22:24
Subject: E-learning Sample (Bengali Short Story : Narendranath Mitra)
To: Sukanta Bhattacharyya <sukanta.polsc@gmail.com>

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : এক সম্পূর্ণ আলোকবৃত্ত
ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য

একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের যে ব্যপ্তি তা এককথায় বিস্ময়কর। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের আগমনে বাংলা কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধ শাখাটি বিস্তৃত হলেও রবীন্দ্র চিন্তার বিশালতা, স্বাতন্ত্র্যতা কোনোভাবেই ভুলে যাওয়ার নয়। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে যে মানুষটির হাত ধরে বাংলা আধুনিক সাহিত্য ধাপে ধাপে এক অন্য উচ্চতাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে , তিনি হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার সদরদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ম্যাট্রিকুলেশন ভাঙা হাইস্কুল থেকে পাশ করেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এরপর একে একে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। বাল্যকাল থেকেই লেখালেখির শুরু। অবশ্যই তা কবিতা দিয়ে, কিন্তু কবিতাতেই শুধু আটকে থাকেননি তিনি। নিজেকে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত প্রাচীরের সীমানা থেকে বৃহত্তর আঙ্গিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। 'মৃত্যু ও জীবন' আর 'হরিবংশ' রচনাদুটির মধ্যে দিয়েই কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঘাবাঘা সাহিত্যিক সমৃদ্ধ আধুনিক রুচিশীল সাহিত্য মহলে অভিষেক ঘটে তাঁর।
নরেন্দ্রনাথের গদ্যের ভাব ও ভাষারীতি, প্রকাশভঙ্গিতে এক মৌলিক ভিন্নতা তাঁকে সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের তুলনায় আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। বিশেষত ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ যতখানি কাহিনির বুননের প্রতি যত্নবান ততখানিই ভাষানির্মাণের বেলাতেও সমান পারদর্শী। আসলে তিনি নিজেকে নিজেই বাঁধতে জানতেন। তাই তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলিও স্বতন্ত্র। চরিত্রের ভাষা কাব্যিকতার বন্ধনীতে পৌঁছে গেলেও কখনোই লাগামহীন হয়ে পড়েনি। তাঁর গদ্যের শরীরের পোস্টমর্টেম করলেও বোঝা যায় যে, কাহিনির গভীরে ডুব দিয়ে তিনি ঠিক মুক্তো আহরণ করতে সক্ষম ছিলেন। রূপক ও প্রতীক উপমার স্বছন্দ ব্যবহার অবশ্যই তাঁর রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাম্প্রতিক সময়ের বহু বিশিষ্ট গদ্যকারও তাই মনে করেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যকে অধ্যয়ন করা, বিশেষ করে তাঁর গদ্যসাহিত্যের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে জীবনকে গভীরতর ভাবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের কৃত্রিমতায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর নয়। জীবন ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে দেখতে হবে বৃহত্তর পটভূমিতে উন্মুক্ত মন নিয়ে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে কথাসাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হলেও তাঁর গ্রন্থাদি আজ মুনাফালোভী বাজারব্যবস্থায় সহজলোভ্য নয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক গল্প ও বেশ কিছু উপন্যাসের স্রষ্টার প্রতি সম্মান দর্শানোয় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এটি। রবীন্দ্রনাথের পরেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে নরেন্দ্রনাথের নাম দেশবিদেশের পাঠকের কাছে সুনাম কুড়িয়েছে। পাঠককে নিমগ্নচিত্তে গল্প-উপন্যাস পাঠে মুগ্ধতার সাথে ধরে রাখার এক অসামান্য শিল্পশক্তির আধার তাঁর সৃষ্টি। প্রায় একান্নটি গল্পগ্রন্থ ও আটত্রিশটি উপন্যাসের স্বার্থক কারিগর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা ছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থাপিত নন। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন প্রমুখ অনেকেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন। এমনকি তাঁর অনেক গল্পই হিন্দি, মারাঠি, রুশ, ইংরেজি, ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অন্যান্য সাহিত্যিকরা যতটা আলোচিত, তার চেয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। তাঁর জন্ম শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই ব্যর্থতার দায় আমাদেরই নিতে হবে।
নরেন্দ্রনাথ মিত্র চোখের সামনে দেখেছেন উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম। তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্পে তাই কোনো ছল বা রঙ মেশানোর প্রয়োজন হয়নি। চেনা মানুষ, চেনা পরিবেশ, অতীত ও বর্তমানের ছবিস্মৃতিকথা আর শ্রুত কাহিনি আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে তাঁর কলমের ডগায়। গ্রামীণ জীবনের ছবি এবং গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর রচনায়। মানুষকে তিনি দেখেছেন সত্যিকারের পূর্ণ মানুষ হিসেবে। একজন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়েই তাদের জীবনকাহিনিকে তুলে ধরেছেন তিনি। তবে কোনো রকম হাল্কা রঙের ছোঁয়া নেই তাতে। নরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ঢঙেই নিজের মতো করে কাহিনি নির্মাণ করেছেন। কোনো রকম পণ্ডিতি ছোঁয়া সেখানে অনুপস্থিত। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে সর্বসাধারণ এসেছে সাবলীলভাবে। বলপূর্বক নিজের মুন্সীয়ানা জাহির করেননি বলেই রচনাগুলি পেয়েছে প্রকৃত জীবনের গতি ও অনাবিল ছন্দ। আর এইভাবেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন জীবনশিল্পী তথা মানুষের কথাকার।
১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগ হয় তখন নরেন্দ্রনাথের বয়স ছিল একত্রিশ। খুব কাছ থেকে তিনি দেশভাগের কঠিনতম দিনগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ছিন্নমূল ও সহায়সম্বলহীন মানুষদের মধ্যে আসলে তিনিও একজন ছিলেন। মাথা ঢাকবার একটুকরো ছাদ , সকলের জন্য মাটি আর অন্ন সঙ্গস্থানের জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষের সাথে। নিজের চোখে

নরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন উদ্বাস্তুদের লড়াই । তাই নরেন্দ্রনাথের বহু গল্প – উপন্যাসে আমরা দেখতে পেয়েছি দেশান্তরিত মানুষের উপস্থিতি । কাহিনির চরিত্র ও বিষয়বস্তু পাঠকের কাছে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে ।

কবিতার হাত ধরে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যচর্চায় অভিষেক হলেও কথাসাহিত্যেই তাঁর শিল্পীমানসের সম্পূর্ণ বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ । চল্লিশের দশকে যারা সাহিত্যকে এক অন্য মার্গে পৌঁছাবার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই চল্লিশের যুদ্ধ ও দেশভাগজনিত কষ্টের ছায়ায় অনবদ্য সব আখ্যান সৃষ্টি করেছেন । নরেন্দ্রনাথ মিত্রও এই তালিকার বাইরে নন । বিশেষত তাঁর গল্পে দেশবিভাগ উত্তর বিপর্যস্ত অর্থনীতি, মন্বন্তর , দাঙ্গা, প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে । জীবন কখনো নিজের দুঃখ বা শুধুমাত্র নিজের সুখের সমষ্টি নয়, নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখময় জীবনেও সুখের আভাস বিদ্যমান তা তিনি বুঝেছিলেন । তাঁর বহু কাহিনির পটভূমিতে দুঃখের স্রোত বয়ে যায় । বলা ভালো যে, দুঃখের বিদীর্ণ প্রান্তর তাঁর রচিত কাহিনিগুলি । আর সেই দুঃখময় সমুদ্রের কোল থেকে তিনি তুলে আনেন বিন্দু বিন্দু সুখের ছটা । সেই সুখের উদ্ভাস তিনি সমগ্র কাহিনির শরীরে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন, যা পাঠক হৃদয়কে সহজেই নাড়িয়ে দিয়ে যায় । গল্পগুলিকে তিনি কৌশলে ও পরিকল্পিতভাবে কদর্যপূর্ণ জীবনের বিপ্রতীপে উপস্থাপন করেন । তাঁর নিজের এই প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি 'গল্প লেখার গল্প' নিবন্ধে বলেছেন , -

> " কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বৈরিতা আমায় লেখায় প্রবৃত্ত করেনি । বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহার্দ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে ।"

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যচর্চার নিরলস পরিশ্রমকে বুঝতে হলে আমাদের যে পথ দিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে, তা হল তাঁর রচিত অজস্র ছোটগল্পের সরণী দিয়ে । তাঁর 'চাঁদ মিঞা' , 'কাঠগোলাপ' , 'চোর' , 'রস' , 'হেডমাস্টার' , 'পালঙ্ক' , 'ভুবন ডাক্তার' , 'সোহাগিনী' , 'আবরণ' , 'সুহাসিনী তরল আলতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পে অর্থনৈতিক – সামাজিক – মানসিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও গল্পগুলিতে আশার প্রদীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । নেতিকে পরাস্ত করে ইতিবাচক জীবনের গল্প হয়ে উঠেছে । অধীনতার খোলসমুক্তিও ঘটেছে তাঁর লেখায় । বিভক্তিজনিত বেদনার বীভৎস ক্ষতকে বাঙালি শিল্পীরা নিজেদের মতো করে উপস্থাপন করেছেন । নরেন্দ্রনাথ মিত্রও এই ভয়ংকর দিনগুলির কথা তুলে ধরেছেন স্বতন্ত্র চেতনায় । তাঁর নির্বাচিত ছোটগল্পগুলিকে পর্যালোচনা করেই আমরা প্রাথমিকভাবে বুঝে নিতে পারি যে, সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের থেকে তিনি কতটা আলাদা ও অপরিহার্য ছিলেন ।

বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় ছোটগল্প 'রস' নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে এনে দিয়েছে প্রভূত সাফল্য, খ্যাতি-সম্মান । ভালোবাসার সঙ্গে জীবিকার অন্যান্য প্রয়োজনের দ্বন্দ্ব নিয়ে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে, 'রস' গল্পটি পাঠককে মুগ্ধ করেছে অনায়াসে । আর এই গল্পটি শুধুমাত্র ভালোবাসার গল্প হয়ে থাকেনি বরং ভালোবাসার সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রতারণা ও রূপসী রমণীর সঙ্গে জীবিকার চাহিদার সংঘাত গল্পটিকে অন্য মাত্রা জুগিয়েছে ।

মোতালেফ শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই একদিন মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে নিকা করে ঘরে তোলে মাজুখাতুনকে । তাঁর পরিচয়, সে ওস্তাদ রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী । নিজের একটা মেয়েও ছিলো । মোতালেফও ইতিপূর্বে একবার সংসার করেছিলো কিন্তু বৌ বছর খানেক আগে মারা যায় । তবে নতুন করে বিয়ে করলেও তাঁর মন পড়ে থাকে চরকান্দার এলেম শেখের বাড়ির অষ্টাদশী মেয়ে ফুলবানুর প্রতি । ধুরন্ধর এলেম শেখ পাঁচ কুড়ি টাকা না পেলে ফুলবানুকে মোতালেফের হাতে তুলে দেবে না । উল্লেখ্য, গফুরকে ভালো লাগেনি বলে ফুলবানুও বাপের বাড়ি চলে এসেছিলো । চরকান্দার নদীর ঘাটে ফুলজানকে প্রথমবার দেখে মোতালেফ আর স্থির থাকতে পারেনা । পাঁচ কুড়ি টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিশ্রম করে সে । নরেন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য স্মরণীয় , -

> " অনেক খাটুনি , অনেক খেজমৎশুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের ... এতো আর মার দুধ নয় , গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানের মুখ দিলেই হলো ..."

মাজুখাতুনও ভোর হওয়ার আগে রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে উনানে রসের জাল দিতো , তারপর সেই রসের জাল আঠালো হয়ে পাটালি হতো । এও প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ । যাই হোক, জৈবিক তাড়নায় পাঁচ কুড়ি টাকা এলেম শেখকে বুঝিয়ে অবশেষে ফুলজানকে মোতালেফ ঘরে তোলে । আর রাজেকের দাদা ওয়াহেদের সঙ্গে আপত্তিকর সম্পর্কের মিথ্যে বদনাম দিয়ে মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দেয় । অপমানিত মাজুবিবি তাই জিভ কেটে বলে, -

> " আউ তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা ... ছি আউ ছি , ভিতর সোন্দার না , এতো শয়তানি , এতো ছলচাতুরি তোমার মনে , গুড়ের সময় পিঁপড়ার মতো লাইগা ছিলা , আর গুড় যাই ফুরাইলো অমনি দূর ... দূর - "

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবি পরিবর্তন করে মোতালেফ । দিনরাত খুব যত্ন করে নতুন বিবি ফুলবানুকে । এরপর ফের ফিরে আসে শীতকাল । রসের সময় , রোজগারের সময় । কিন্তু ফুলবানু জানেনা কিভাবে জলের মতো খেজুর রস জাল দিয়ে পাটালি গুড় তৈরি করতে হয় । উঠোনভর্তি রসের হাঁড়ি দেখে বরং তাঁর ক্লান্তি লাগে। মোতালেফের মনে পড়ে যায় মাজুখাতুন –এর কথা । হাটের দিনে পাটালি বিক্রি হয় বটে, কিন্তু পরের হাটবারে মানুষজন তাঁকে অপমান করে । গুড় বিক্রি লাটে ওঠে , গাছ কাটায় সার হয় । গল্পের একেবারে অন্তিম দৃশ্যে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি যে, একদিন ভোরবেলা দু'হাঁড়ি রস নিয়ে নৌকায় নদী পার হয়ে নাদির শেখের বাড়ি উপস্থিত হয় মোতালেফ । তাঁর আবেদন নাদিরের বউ যেন সেই রস জাল দিয়ে দুই সের গুড় তৈরি করে দেয় । মোতালেফের কণ্ঠস্বর শুনে নাদিরের বর্তমান স্ত্রী মাজুখাতুনের মন ভিজে যায় । কয়েকমাস আগেই নাদির শেখ নিকা করেছে মাজুখাতুনকে । মোতালেফ বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওর ছলছল করে ওঠা চোখ দেখে , কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না ।

এই গল্পের মধ্যে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেভাবে সহজ ভাষাতে জটিল মনস্তাত্ত্বিক এবং কঠিন আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে রূপদান করেছেন তা এককথায় বিরল । গল্পের ভাববস্তুর উপস্থাপনায় সরলতার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর তিনি করেছেন ভাষার প্রতিটি অনুপুঙ্খে । গ্রামীণ পরিবেশে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের প্রতিটি কণিকা মূর্ত হয়েছে গাল্পিকের শ্রমদীপ্ত ভাষায় । উল্লেখ্য, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই গল্পটিকে অবলম্বন করে একটি হিন্দি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয় । মোতালেফের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন ।

' কাঠগোলাপ ' গল্পটি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগজনিত কারণে স্বদেশত্যাগীদের করুণ জীবনের আখ্যান হলেও গল্পের শেষে সেই করুণ আর্তি আর বজায় থাকেনি । নীরদ আর অণিমার জীবনের করুণ চিত্র গল্পটিকে গতি প্রদান করলেও শেষ পর্যন্ত সেই কাহিনিকে অন্য মাত্রা এনে দেয় গল্পের শুভ সমাপ্তি । দেশভাগের পর কলকাতার বাংলাদেশী নাগরিকদের জীবনবাস্তবতা ছিল কঠিন। বাস্তবতাবিমুখ অণিমার

বাস্তবভূমিতে নেমে আসা এবং প্রতীকী অর্থে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে একটি ফুলের সাথে তুলনা করার মধ্য দিয়ে কষ্টের নিগড়ে পড়ে থাকা জীবনের মধ্যে যেন আশার উপ্ত বীজের সন্ধান লেখক এনে দিয়েছেন । নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই সত্যের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে মিথ্যের রঙের আস্তরণ লাগাননি ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত ' ঘাম ' গল্পটি প্রসঙ্গে সমালোচক কায়েস আহমেদ বলেছেন যে,

> "তাঁর ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর 'রস', 'ঘাম' ইত্যাদি বহু গল্প বাংলা সাহিত্যে চিরায়ত সম্পদ হয়ে থাকবে ।" (চতুরঙ্গ , পৌষ ১৩৭০)

এই গল্পটিও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনেক গল্পের মতো জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্প । এই গল্পে দাম্পত্যজীবনের কলহ যেমন আছে তার ভেতরে ভালোবাসাও আছে । নিঃসন্তান এক দম্পতির ছবি অত্যন্ত মমতার সাথে তিনি এঁকেছেন এই গল্পে । এই গল্পের চরিত্র সুনন্দার একটা সন্তানের জন্য মন ব্যকুল হয়ে উঠে , আর তাই সে স্বামী বিজনের নিষেধ সত্ত্বেও পাশের ফ্ল্যাটের অমূল্যবাবুর শিশুটিকে ভালোবাসে , আদর করে । বিজন এসব সহ্য করতে পারে না। পাঠক লক্ষ করে অতি বাৎসল্যে সুনন্দার স্তন্য বের না হয়ে 'ঘাম' বের হতে থাকে । যে মাতৃত্বের স্বাদ নারী জনমকে সার্থক করে , সুনন্দার জীবনে সে স্বাদ পূরণ না হওয়ায় একটা হাহাকার লক্ষ করা যায় ।

'দোলা' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র চিত্রিত করেছেন যে, ভালোবাসা কতো কঠিন এবং তা পাওয়া আরও কঠিন । অর্থ দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া যায় কিন্তু ভালোবাসা অন্য কিছু । ভালোবাসা পেতে আরো অনেক কিছু দিতে হয় । এই গল্পে অতুলকে দেখি, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দায়িত্ববোধ-কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতে গিয়ে নিজেই জড়িয়ে গেছেন বৃহৎ এক চোরাবালিতে । অফিসের কেরানী মতিলাল দে, সামান্য চাকরির পয়সায় জীবনে কিছুই করতে পারেননি । সেই সর্বজনবর্জিত মতিলাল দেহত্যাগ করলে সৎকারের দায়ভার বর্তায় অতুলের কাঁধে । মতিবাবুর বিধবা স্ত্রী এবং চারটে মেয়ের দায়িত্বের বোঝা ফেলে দিতে পারেননি হতভাগা অতুল । বরং একসময় মতিবাবুর বড় মেয়ে শান্তিকে বিয়ে করে সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় সে । কিন্তু সে সম্পর্কও মজবুত হয়নি । একদিন প্রণবের সঙ্গে পালিয়ে যায় শান্তি । একসময় শান্তির মা তাঁর মেজো মেয়ে সুধাকে বিয়ে করার জন্য বলে , কিন্তু অতুল আর রাজি হয়নি । নানান দোলাচলের মধ্যে দিয়ে গল্পটি একটি কঠিন গন্তব্যে মিশে গেছে ।

দুজন নারী পুরুষের ভালোবাসা এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প 'একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার ১৩৭১ বঙ্গাব্দের দোল সংখ্যায় । সুরজিত এবং বিপাশা এই দুই মানুষের প্রেমের কাহিনি। তবে 'প্রেমের কাহিনি' বলা কতটা যুক্তি সঙ্গত সেই বিষয়টি একটু ভেবে দেখার কারণ বিপাশা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে আসলে সে সুরজিতকে বিয়ে করবে কিনা । দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা । সুরজিত গরীব আর বিপাশা ধনী পরিবারের মেয়ে । এই টানাপোড়েনের গল্পে পাঠকের নতুন ভাবনার রসদের অভাব ঘটে না ।

'চোর' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অমূল্যের চৌর্যবৃত্তির অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন । অমূল্যের স্ত্রী রেণু যেমন স্বামীর চৌর্যবৃত্তির কারণে স্বামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তেমনি অমূল্যও স্ত্রী রেণুর প্রতি সমান তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে । শুধু তাই নয়, কাঁসার বাটি চুরির পরামর্শও স্ত্রীকে দেয় সে । চুরির দায়ে দোকানের চাকরি চলে গেলেও চুরির স্বভাব ঘোচে না । তবে আমাদের মনে হয় যে, অমূল্যের চৌর্যবৃত্তির কাহিনির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ রেণুর চোর হয়ে ওঠার কাহিনি । অর্থসংকট আর স্বামীর সহচর্যে চোর হয়ে ওঠে রেণু । তবে এত অন্ধকারের মধ্যেও ইতিবাচক ইঙ্গিতও রয়েছে গল্পের শেষাংশে । চুরির পেশার প্রতি অমূল্যেরও ঘৃণা আছে । সবমিলিয়ে গল্পের বুনন, সংলাপ, নিম্নবিত্তের স্বরূপ, নারীর অসহায়ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে গল্পটি হয়ে ওঠে সদর্থক জীবনের গল্প ।

'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিকল্প' গল্পটিকে প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক আলোচনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বড় গল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন । এই গল্পে একজন কৃপণ পিতা হরগোবিন্দ এবং তার দুই ছেলে মেয়ে সুধা ও হাবুলের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । নিজের সন্তানদের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন পিতা হরগোবিন্দ । মাতৃহারা বলে সন্তানদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখাতে যাওয়া, ভালোমন্দ কিনে দেওয়া সবই করেন হরগোবিন্দ । মেয়ের বিয়ের জন্য ভালো পাত্রও দেখেন তিনি । কিন্তু হাবুলের প্রাইভেট টিউটর ইন্দুভূষণ সুধার জীবনটাকে অন্যরকমভাবে তছনছ করে ফেলে । হরগোবিন্দ বাবু ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি । ছেলে ছোকরা দিয়ে ইন্দুভূষণকে ভয় দেখাতে গিয়ে উত্তম – মধ্যম একটু বেশি হয়ে যায় । অবশেষে সপ্তাহখানেক জ্বরবিকারে হাসপাতালে থেকে ইন্দুভূষণের মৃত্যু হয় । এই ঘটনার পর থেকেই সুধা বদলে যায় । সুধা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে । মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয় । হরগোবিন্দ বাবু যখন বলেন –

" তুই কি বিধবা , তোদের কি বিয়ে হয়েছিলো ?"

সুধা তখন সাফ জবাব দেয়,

" মন্ত্রপড়া বিয়েটাই কি সব ?"

সুধা বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে । হরগোবিন্দ বাবা হয়ে সব দেখেন এবং কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না । বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাঁর মিনতি ভালোবাসার কাছে পরাজিত হয় । গল্পটির মধ্যে ভালোবাসাকে ভালোবাসার জায়গায় রেখে বিচার করা হয়েছে । ভাষার সরলতার মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে এই গল্পের ভেতরে ভেতরে ।

'চাঁদমিঞা' গল্পে কয়েক স্তরে কষ্টের চিত্র ফুটিয়েছেন লেখক । নশরত আলীর চার-পাঁচ স্ত্রী মারা গেছে । ঘরে আছে আর চারজন । তাঁর শেষতম স্ত্রী রাবেয়া নশরত আলীর ঘোড়ার সহিস চাঁদমিঞাকে ভালোবাসে । নশরত আলী বিষয়টি বুঝতে পেরে একদিন চাঁদমিঞাকে নির্মমভাবে আঘাতে আঘাতে মৃতপ্রায় করে দেয় এবং নিজের স্ত্রী রাবেয়াকে গলা টিপে হত্যা করে । দুঃখের গভীর আস্তরণ সত্ত্বেও গল্পের পরিশেষে দুঃখবোধ ম্লান হয়ে যায় কাহিনির শেষাংশের গুণে । কাহিনির শেষ দৃশ্যে জানা যায়, শেষ জীবনে নশরত আলী এবং চাঁদমিঞার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এমনকি মালিক-ভৃত্যের সম্পর্ক উঠে গিয়ে বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয় তাঁদের সম্পর্ক । লেখক গল্পের বয়নে সাবধানতার সাথে সমাজের প্রকৃত অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং গল্পের পরিণতিতে সংকটাপন্ন সময়ে আশাবাদী ভাবনাকে যুক্ত করে অভিনবত্বের পরিচয় দেন ।

'পালঙ্ক' গল্পে একটি পালঙ্ককে ঘিরে আবর্তিত গল্পের কাহিনি । এটি একটি প্রতীকী গল্প । এখানে আভিজাত্য বা বংশগৌরব এবং সেই সঙ্গে দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে । সামন্তবাদের শিকড় গল্পের আপাদমস্তক শরীর জুড়ে । অবস্থাপন্ন রাজমোহন এবং প্রান্তিক ভূমিহীন নিঃস্ব মকবুলের মধ্যের চরম লড়াই পাঠক প্রত্যক্ষ করে। অসীমার বাবার যৌতুক হিসেবে দেওয়া পালঙ্ক ঘিরেই গল্পের কাহিনি এগিয়েছে । গল্পকার এই গল্পে পালঙ্ককে সম্ভ্রান্তের প্রতীক রূপে দাঁড় করান । দেশভাগ হলেও রাজমোহন পৈতৃক ভিটা ছেড়ে যাবেন না পণ করেছেন । শেষমুহূর্তে পাঠক লক্ষ করে, পালঙ্কের জন্য ঝড়বৃষ্টির রাত্রে জ্বর গায়ে রাজমোহনবাবু মকবুলের বাড়ি এসে উপস্থিত হয় এবং যখন দেখতে পান ওই

পালঙ্কে দুটি শিশু মরার মতো শুয়ে আছে, তখন তাঁর মনে হয় যেন রাধাগোবিন্দ শুয়ে আছে তার সাধের অহংকারের পালঙ্কে । অভাব-অনটনের মধ্যেও যে মকবুল পালঙ্কটাকে বিক্রি করেনি এটাই তাৎপর্যপূর্ণ। লেখক গল্প জুড়ে রাজমোহনের যে সীমাহীন আকুতি তুলে ধরেছেন তা প্রশমিত হয় । এইখানেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বাতন্ত্র্য । ক্রমশ সিঁড়ি বেয়ে দুঃখের শীর্ষে পৌঁছাতেই হঠাৎ করে সুখের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।
'আবরণ' গল্পের চাঁপা মন্বন্তরের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি । পড়নের প্রয়োজনীয় কাপড় নেই চাঁপার , যা দিয়ে সে শরীর আবৃত করতে পারে । চাঁপার করুণ অবস্থা নিবারণ করতে স্বামী বংশী শেষ্পর্যন্ত যৌনকর্মীর কাপড় আনার চেষ্টা করেছিল । এই দুঃসহ জীবনের মধ্যে বংশীর কাপড় জোগাড়ের চেষ্টায় এবং যৌনকর্মী সুখদার দগদগে ক্ষতবিশিষ্ট বুকের দিকে তাকিয়ে কাপড় ফেরত দেওয়ার দৃশ্যের মধ্যে লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এখানেই লেখকের মুন্সীয়ানা ।
'হেডমাস্টার' গল্পে লেখক কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু চরিত্রটির মধ্যে এক টিপিক্যাল চরিত্রকে সৃষ্টি করেছেন । পাকিস্তানের কোনো এক অখ্যাত গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার । অর্থনৈতিক সংকট তাঁর জীবনের নিত্য সঙ্গী । তারপরও শেখানোর অদম্য এক চেষ্টা তাঁর মধ্যে লক্ষ্যনীয় । দেশভাগের পর যখন শিক্ষকতার আয় দিয়ে তাঁর আর সংসার চলছিল না তখন শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে এক শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাংকের চাকরি নেন তিনি । এরপর শুরু হয় সকলের কাজের মধ্যে ভুল ধরার পর্ব । দীর্ঘকালের শিক্ষকতার স্বভাব ভুলতে পারেন না তিনি । সব বাস্তব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গল্পের শেষাংশে পাহারাদারদের নিয়ে তার যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নে জীবনকে সুন্দর করে দেখার প্রবণতা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় । কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকারের জীবনের কষ্টের দিন সম্পূর্ণ রূপে শেষ না হলেও মানুষকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্ন গল্পটিকে একটি শুভজীবনের মানদণ্ডে উন্নীত করে । একজন আদর্শবান শিক্ষকের প্রকৃত চরিত্রটি লেখক বেশ কৌশলে তুলে এনেছেন, এখানেই হয়তো গল্পটির স্বার্থকতা ।
'গণ্ডী' গল্পটিতে মৃগাঙ্ক বাবুর চরিত্রটিকে লেখক অত্যন্ত যত্নের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন । পেশায় উকিল, সন্তানহীন, মাঝবয়সী ভদ্রলোক মৃগাঙ্ক বাবুর সাথে স্ত্রী নীলিমার মনের মিল নেই । স্বামীর প্রায় কোনো কিছুই নীলিমার পছন্দ হয় না । আবার রীণার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ঘুচে নীলিমা যখন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, একটা মা-মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই বিষয়টি মৃগাঙ্ক বাবু কোনোভাবে মেনে নিতে পারেন না । মানসিক এক জটিলতার চিত্র পাঠক অনুভব করে । যা লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যেও লক্ষ করা যায় । আসলে কিছু মানুষ নিজের গণ্ডির মধ্যেই থাকতে পচ্ছন্দ করেন । নিঃসন্তান হওয়ায় মৃগাঙ্ক বাবুর মনে শূন্যতাও যথেষ্ট । এই গল্পের মধ্যে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র চেষ্টা করেছেন পাঠক –এর মনে এই সত্য তুলে ধরতে যে, মানুষের ওপর দেখে বিচার করা ঠিক নয় । মনের গভীরে যে আরেক মানুষ থাকে , তার হদিস রাখাও ভীষণ প্রয়োজন ।
বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত 'সোহাগিনী' ('তুফানী' নামে প্রথম প্রকাশ 'দেশ' পত্রিকার ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের পূজা সংখ্যায়) গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি ভিন্ন ধারার গল্প । এই গল্পে ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতিতে তুফানীর মৃত্যু হয় । তুফানীর স্বামী বনমালী স্ত্রীকে মতি মিঞার বাড়ি থেকে আসতে দেখে নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা তুফানীকে বেদম প্রহার করলে তার মৃত্যু হয় । সেই রাতেই শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় । গল্পটি কিন্তু এখানেই শেষ হয় না । গল্পের শেষে দেখা যায়, শেষকৃত্য শেষে বনমালী এবং মতি মিঞা দুজনেই বর্ষারাতে শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত । দুজনেই অনুশোচনায় দগ্ধ । নরেন্দ্রনাথ মিত্র এভাবেই গল্পের শেষে জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন পাঠককে । দুজন মানুষের ভালোবাসাকে এভাবে রঙ তুলি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে লেখক যে শ্মশানের দৃশ্যটির অবতারণা করলেন তা চমৎকার । বাস্তবিক অর্থে গল্পটির মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা উঠে এসেছে, কিন্তু ভালোবাসার ভয়ঙ্করতম দিকটিও লেখক দেখাতে চেয়েছেন – যা আমাদের বিবেককে নাড়া দিয়ে যায় ।

এইভাবে আলোচনা করে পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধসহ আরও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলেও তার রচনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিক্ততা ও প্রতিবাদের স্বাদকে ছাপিয়ে গিয়ে বড় হয়ে উঠেছে জীবন বাস্তবতা ও আশার ইতিবাচক দিকটি । তাঁর প্রায় সমসাময়িক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) প্রমুখ ছোটগল্পকারদের থেকে তিনি ভিন্নধর্মী ছোটগল্পের জগত তৈরি করলেন । জটিল মনস্তত্ত্বের বর্ণনা, মানুষের পতনের মধ্যেও মানবিকতার উজ্জ্বল উপস্থিতি, জীবনের পঙ্কিলতা উত্তীর্ণ হওয়া, নারীসমস্যার কথা তুলে ধরা, আঙ্গিকের নতুনত্ব –এসবই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনার বৈশিষ্ট্য । এবং তা শুধু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই নয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও । নিজের 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের আলোচনায় তিনি বলেছেন যে,

> "আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই । পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে ।"

'দ্বীপপুঞ্জ', 'রুপমঞ্জরী' , 'চেনামহল' , 'তিন দিন তিন রাত্রি' , 'জলপ্রপাত' , 'নতুন ভুবন' , 'জলমাটির গন্ধ', 'সূর্যমুখী' প্রভৃতি উপন্যাসে শান্ত নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবনের পাশাপাশি নগরমুখী মফস্বল শহরের ভাসমান মধ্যবিত্ত এবং মহানগরী কলকাতার বিভিন্ন প্রতিভাত হয়েছে । নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর রচনাই নিষ্পেষণের চিত্রের মাঝেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন যুক্ত করেন । সেখানে বেজে ওঠে আশার গান । জীবনের সীমাহীন কদর্থক অনুষঙ্গের আড়াল থেকে উঠে আসে তার প্রধান প্রবণতা – আশাবাদের জয়গান । এভাবেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র জীবনের সম্পূর্ণ আলোকবৃত্তকে স্পর্শ করেন । হয়ে ওঠেন অদ্বিতীয় ।

****

সহায়ক গ্রন্থ –

১। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী , প্রথম খণ্ড , গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩ , ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ।
২। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী , দ্বিতীয় খণ্ড , গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩ , ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ।
৩। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী , তৃতীয় খণ্ড , গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩ , ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ।
৪। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী , চতুর্থ খণ্ড , গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩ , ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ।
৫। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১৩ ।
৬। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১১ ।
৭। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১১ ।
৮। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ১৯৯৪ ।
৯। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১২ ।
১০। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১২ ।
১১। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , গল্পমালা ৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১১ ।
১২। মিত্র নরেন্দ্রনাথ , কিশোর কাহিনি সমগ্র , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা , জানুয়ারী ২০১৩।

১৩। Ray Amitava, Narendranath Mitra - Selected Short Stories, Sahitya Akademi, India, 1998.